উপকূলীয় অঞ্চল নীতি

২০০৫

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচী

১। **ভূমিকা** ---------- ১

১.১ উপকূলীয় প্রতিবেশ ---------- ১

১.২ বিদ্যমান নীতিমালা ---------- ১

১.৩ যৌক্তিকতা ---------- ২

২। **ঘোষণা** ---------- ২

৩। **উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা** ---------- ২

৩.১ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র ---------- ২

৩.২ সমন্বিত ব্যবস্থাপনা উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নের চাবিকাঠি ---------- ৩

৩.৩ লক্ষ্য ---------- ৩

৪। **নীতিমালা** ---------- ৩

৪.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ---------- ৩

৪.২ মৌলিক চাহিদা ও জীবিকায়নের সুযোগ ---------- ৪

৪.৩ ঝুঁকি কমানো ---------- ৫

৪.৪ প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ---------- ৬

৪.৫ সুষম বণ্টন ---------- ৮

৪.৬ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ---------- ৮

৪.৭ নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষ সমতা ---------- ৯

৪.৮ সংকটাপন্ন প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ---------- ৯

৫। **অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ** ---------- ১১

৫.১ উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ ---------- ১১

৫.২ কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ---------- ১১

৫.৩ বাস্তবায়ন ---------- ১২

৫.৪ সমন্বয় ---------- ১৩

৫.৫ সহায়ক কার্যাবলী ---------- ১৪

৫.৬ আইনগত কাঠামো ---------- ১৫

১. ভূমিকা

১.১ উপকূলীয় প্রতিবেশ

বাংলাদেশের মোট আয়তন ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা সমন্বয়ে গঠিত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদীমালা বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। বঙ্গোপসাগর বরাবর উপকূলীয় তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১০ কিঃ মিঃ।

সংকট ও সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল। এখানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বেশি। এছাড়া প্রাকৃতিক ও মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ যেমন নদী ভাঙ্গন, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা, ভূমিকম্প, পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা, নানা রকমের দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার ধারা যেমন বাধাগ্রস্ত হয়েছে তেমনি এ অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও হয়েছে মন্থর।

দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন সম্ভাবনা আছে যা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থবহ অবদান রাখতে পারে। উপকূলীয় মাছ ও চিংড়ি, বন, লবণ এবং খনিজদ্রব্যসহ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক সম্পদের সমাহার এই অঞ্চলে বিদ্যমান। এখানে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর এবং পর্যটন ও অন্যান্য শিল্পের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বেলাভূমি ও সমুদ্রবক্ষে প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণের সম্ভাবনাও বিশাল। এসব সম্পদের অনেক কিছুই এখন পর্যন্ত অনাহরিত এবং এগুলোর অনেক অংশ ব্যবহারের সুযোগ ও সম্প্রসারণ করার অবকাশ রয়েছে ।

এ ছাড়াও উপকূলে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণযোগ্য কিছু প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেম আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ প্রতিবেশ সুন্দরবনের অংশবিশেষকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে সেন্টমার্টিন দ্বীপে রয়েছে প্রবাল প্রতিবেশ। উপকূলীয় অঞ্চল শুধু জীববৈচিত্র্যের এক বিশাল আধারই নয় বরং এই এলাকা একটি সার্বজনীন সম্পদের পরিবেশগত ভিত্তি। এই সম্পদের এক বিরাট অংশ হলো বঙ্গোপসাগরের রকমারি মৎস্য ভান্ডার ।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা, প্রকৃতি ও মানুষের বৈরীতার কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সুযোগের অপ্রতুলতা, গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত আধার ইত্যাদি কারণে সমন্বিত উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। এই উপলব্ধি থেকেই সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা, কৌশল (দারিদ্র্য হ্রাসের জাতীয় কৌশলসহ) এবং বিভিন্ন পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নের বিষয়গুলো বারংবার উপস্থাপিত হয়েছে ।

১.২ বিদ্যমান নীতিমালা

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময়ে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদনের লক্ষ্যে নিজস্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে। মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে এবং এই নীতিগুলোর [১] সাথে উপকূলীয় বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

[১] পরিবেশ নীতি (১৯৯২) ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম (১৯৯২), জাতীয় বন নীতি (১৯৯৪), পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি (১৯৯২), জাতীয় মৎস্য নীতি (১৯৯৮), জাতীয় পর্যটন নীতি (১৯৯২), জাতীয় জ্বালানী নীতি (১৯৯৬), নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতি (১৯৯৮), জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি (২০০১), জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৯৭), জাতীয় শিশু নীতি (১৯৯৪), নারী উন্নয়নের জন্য জাতীয় নীতি (১৯৯৮), জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯), জাতীয় কৃষি নীতি (১৯৯৯), শিল্প নীতি (১৯৯৯), জাতীয় নৌ নীতি (২০০০), জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি (২০০১), জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি (২০০০)

১.৩ যৌক্তিকতা

সরকার প্রধানত তিনটি কারণে উপকূলীয় অঞ্চল নীতির যৌক্তিকতা বিবেচনা করছে :

ক. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপকূলীয় অঞ্চল নানাভাবে পিছিয়ে আছে;

খ. বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় অনগ্রসরতা ও পরিবেশের ক্রমাবনতি;

গ. জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার প্রচুর সম্ভাবনা উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান।

২. ঘোষণা

উপকূলীয় অঞ্চল দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে বিভিন্নভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সকলের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে উপকূলীয় সম্পদ ব্যবহারে দ্বন্দ্ব নিরসন এবং বিভিন্ন সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা রচিত হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপকূলীয় অঞ্চলের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সাধারণ দিক-নির্দেশনা দেবে। এর ফলে উপকূলীয় জনগণ একটি নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি খাত-কেন্দ্রিক পরিধির ঊর্ধ্বে বিভিন্ন খাতের নীতিমালার একটি সমন্বিত রূপ। এই নীতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার উপকূলীয় অঞ্চলে নিজ নিজ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমন্বয়ের একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়ার সূচনা করবে।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি পর্যাবৃত্তে হালনাগাদ এবং প্রয়োজন বোধে সংশোধন করা হবে।

৩. উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা

৩.১ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র

বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এদের "কোন না কোনটির " প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বলয়ে রয়েছে ১৯টি জেলা[২]।

এ জেলাগুলোর সবকটি উপজেলা/থানাকে উপকূল অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে সাগর পাড়ের ৪৮টি উপজেলা/থানা নানান প্রাকৃতিক কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলকে (EEZ) উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে ধরা হয়েছে।

দেশের স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল গঠিত। ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৩ কোটি ৪৮ লাখ।

[২] জেলাগুলো হচ্ছে বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোহর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালি, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, শরীয়তপুর ও পটুয়াখালী।